দুর্গাপূজা-চিত্রাবলী

শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়

ও

শ্রীবিষ্ণুপদ রায়চৌধুরী

প্রণীত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৩৬

শিল্পাচার্য শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৺শ্রীশ্রীদুর্গা শরণম্

যশ্চিত্রেষু নিবেশ্য রূপমতুলং বিশ্বস্য নানাবিধং
স্বোপজ্ঞং চ বিকল্প্য বিস্ময়পদং লোকস্য জাতঃ সুধীঃ।
যাতং পারমহো বিলঙ্ঘ্য জলধিং যস্যাকলঙ্কং যশঃ
স শ্রীমানবনীন্দ্রনাথ-বিবুধো জীয়াৎ কলানাং গুরুঃ ॥

এষা লোকবিনোদিনী সুকৃতিনাং ধর্ম্মস্য বিদ্যোতিনী
নানাচিত্রকথাময়ী ধ্বনিপদং প্রাপ্তা নবা পুস্তিকা।
ভক্তিমূর্ত্তিমতীব চারুরচনা চৈতন্য-বিষ্ণুপ্রিয়া
বালানন্দবিবর্দ্ধিনী তব গুরো প্রীতিং করোত্বর্পিতা ॥

ভূমিকা

ছবি দেখতে, গল্প শুনতে, সকলেই আমরা ভালবাসি। তাই সব দেশেই, সব সময়েই, ছেলেদের যাঁরা ভালবাসেন—জীবনকে যাঁদের ভাল লেগেছে—সেই ঠাকুরমা, ঠাকুরদা, বাবা, মা, শিল্পী, কবি—ছেলেদের জন্য ছড়া কেটেছেন, গল্প বলেছেন, গান গেয়েছেন, ছবি লিখেছেন, তাদের খুশি করবার জন্য ভয় ভাঙাবার জন্য। বড় হয়ে তাঁরা জেনেছেন যে ছোটরাই বড় হবে। তাঁদের এই বড় হওয়াটা ভাল লেগেছে এবং ছেলে-মেয়েদের ভালবেসে তাদের ভয় ভাঙিয়ে, চোখ ফুটিয়ে, আনন্দ ও জ্ঞান দিয়ে, বড় হতে—পণ্ডিত হতে, জ্ঞানী হতে, বীর ও সাধু হতে সাহায্য করে গেছেন নানা উপায়ে। তাই সকলেই আমরা ছেলেবেলায় মা, বাবা, ঠাকুরদা, ঠাকুরমা প্রভৃতি বড়দের মুখ থেকে গল্প শুনেছি, গান শুনেছি, ছবি দেখেছি।

আমাদের আগে যাঁরা জন্মেছেন, পৃথিবীর জ্ঞানী বা ঋষিরা, শিল্পী ও কবিরা, আমাদের বড়রা, যাঁরা মহাজন তাঁরা অনেক কষ্ট করে বড় হয়ে ওঠবার, ভাল হয়ে ওঠবার, ধীর হবার, বীর হবার এবং আনন্দ পাবার যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, সেই দৃষ্টি, সেই জ্ঞানই ভালবেসে ছোট ছেলেদের হাতে তুলে দিয়েছেন, ছেলেরা যা ভালবাসে—খেলা-করা, গল্প-শোনা, ছবি-দেখা, এই সবের মধ্যে দিয়ে। এত দিন ধরে চোখ-কাণ খুলে, তনু-মন এক করে জীবনের রূপ দেখে, গান শুনে এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তাঁরা যে, ভালবাসাই মানুষকে বড় করতে পারে, ভয় ভাঙিয়ে চোখ ফোটাতে পারে, যথার্থ জ্ঞানী এবং বীর করে তুলতে পারে ; এবং এই জীবনের সব-কিছুই চির কাল ধরে চলে আসছে, প্রতি মুহূর্তে নানা রঙ ও রূপের বদল শুধু,—সুখ দুঃখ জীবন মৃত্যুর খেলা,—এ যেন খেলাঘর, যারা যত খুশি হয়ে ভাল করে খেলে যাবে এই খেলার ঘরে তারাই বড়, তারাই জ্ঞানী।

খেলা দেখে কবি হয়ে উঠল মানুষ, ছড়া কাটলে, ছবি আঁকলে এই বলে: "তারাই ভাঙে গড়ে মনের খেলাঘরে বালুর গড়া যত সুখ ও দুখ।"—

বাঙলা দেশের ছেলে-মেয়ে পদ্মার চরে, তাদের ঘরের আঙিনায় বালু দিয়ে ঘর ভাঙা-গড়ার খেলা খেলছে, পটে এঁকে শিল্পী ছেলেদের এই ছবি দেখালেন জীবনের।

এমনি করেই সনাতন শিশু-মানুষের চোখ ফোটাবার জন্য, তাকে আনন্দ দেবার জন্য, পৃথিবীর ঠাকুরদাদা ঠাকুরমায়ের দল, শিল্পী কবি গাইয়ে বাজিয়ের দল, কুমার কামার স্থপতি পাথুরিয়া, সবাই মিলে, জীবনের সব সৃজনে, সব প্রকাশে যিনি ছড়িয়ে আছেন শিশুর চঞ্চলতা নিয়ে,—তাঁকে খুঁজে বের করলেন। পৃথিবীর শিশুকেই বললেন, "তুমি ভগবান্, তুমি আমার খেলার সাথী, জীবনের সব-কিছুতেই আমি তোমাকে দেখছি।" তার পর তাঁরা খুশি হয়ে উঠলেন, ভাবুক হয়ে উঠলেন। ধ্যান ধরে কেউ গাইলেন গান, কেউ আঁকলেন পট, কেউ লিখলেন গল্প, কেউ মূর্তি গড়লেন।—মানুষ কবি হয়ে উঠল,—ব্রাহ্মণ হয়ে উঠল। আর পৃথিবীর সব ছেলে-মেয়েরা তাঁদের ঘিরে জয়ধ্বনি করে মেতে উঠল নানান খেলায়। দিগ্দেশে জীবনের সভ্যতার জ্ঞানের রঙবেরঙের জয়পতাকা চির কাল ধরে উড়তে লাগল ;—চির কাল ধরে ছেলে-মেয়েরা দেখতে লাগল সভ্যতার পর সভ্যতা, সমুদ্রের ঢেউএর মত, আকাশের মেঘের মত কালের বুকে ভেসে উঠছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে,—শুধু রেখে যাচ্ছে পরের যুগের শিশুদের আনন্দের জন্য, জ্ঞানের জন্য, কোথাও একটি স্তূপ কোথাও বা পাহাড়ে খোদা গুহা-মন্দির,—তাজমহল, নটরাজ, শিবকামসুন্দরী, বুদ্ধের মূর্তি, কোথাও দেওয়ালে বা পটে আঁকা ছবি, মানমন্দির, তাদের পিতৃপুরুষের কীর্তি।

শিশুর দল এই সব দেখলে।—আগের যুগের পাকা হাতের গড়া মূর্তি, আঁকা ছবি, আনন্দে গড়া গান, কবিতা, মন্ত্র, তাদের মুগ্ধ করে দিলে। মন ভুলিয়ে দিলে গান শুনিয়ে, চোখ জুড়িয়ে দিলে রূপ দেখিয়ে। এমনি করে দলের পর দল শিশু ছোট থেকে বড় হচ্ছে—বড়দের সঙ্গে খেলতে খেলতে। দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে, শিশু ক্রিয়াশীল যুবক হয়ে উঠল। দিকে দিকে সভ্যতা প্রসারিত হল। ধনে ধান্যে, জ্ঞানে পুণ্যে, বিশ্বব্যাপী মানুষের খেলা চলল। ছবির ভিতর দিয়ে মানুষের সেই বিরাট্ খেলাঘর তোমাদের দেখাব।

এখন ছবির বিষয়ে দুএক কথা বলি।

মুখে কথা বলে বা সেই বলা কথাকে কর্তা কর্ম ক্রিয়া পদের নিয়মে ফেলে অক্ষর ও বর্ণমালা-দ্বারা প্রকাশ করাকে ভাষা বলে। অপরের বলা বা লেখা কথা বুঝতে গেলে যেমন ভাষা জানার দরকার তেমনি আঁকা ছবিরও সব ভাষা

আছে। ছবির কথা ঠিক ঠিক বুঝতে গেলে ছবির ভাষাও শিখতে হবে। কোন ভাষা-শিক্ষার সহজ উপায় হচ্ছে, ভাষার প্রকাশের সঙ্গে অবাধ পরিচয় করা। মার মুখের কথা শুনতে শুনতে ব্যাকরণ না পড়েও যেমন ছেলেতে শুদ্ধ ভাষা বলতে ও বুঝতে শেখে তেমনি ছবি আঁকার ব্যাকরণ ও ইতিহাস না পড়েও মায়ের মুখের কথার মত সরল ও প্রকাশক্ষম পাকা শিল্পীর হাতে আঁকা ছবি বা মূর্তির সঙ্গে শিশু অবস্থা থেকে অবাধ মিলনের সুবিধা থাকলে ছবির ভাষাও মানুষ সহজে বুঝতে শিখবে। ছবি ও মূর্তি রচনার ভিতর দিয়েও যে মানুষ নিজের বড় হয়ে ওঠবার ইচ্ছার কথা প্রকাশ করছে, প্রাপ্তির কথা ব্যক্ত করছে তা আর আজকের আমাদের মত তোমাদের বুঝতে কষ্ট হবে না—যদি তোমরা মন দিয়ে এই ছবিগুলি দেখ। তোমরা অর্থাৎ ভবিষ্যতের আমরা জীবন থেকে অধিকতর আনন্দ লাভে সক্ষম হব। রূপের সান্নিধ্যেই রূপদৃষ্টি লাভ হয়, ছবির ভাষা বোঝা যায়।

পূর্বের সমাজ-ব্যবস্থায় সর্বসাধারণের যাতে রূপদৃষ্টি লাভ হয় বহু দিন বহু পরীক্ষা করে পাল পার্বণ ব্রত কথা প্রভৃতি সামাজিক উৎসবাদির মধ্যে পট মূর্তি ও আলপনার স্থান করে দিয়ে সহজে রূপ-শিল্পের ভাষা সর্বসাধারণকে শিক্ষা দেবার অভিনব উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন—প্রাচীনেরা।

শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়
শ্রীবিষ্ণুপদ রায়চৌধুরী

দুর্গাপুজা-চিত্রাবলী

১

এক সরোবরের সমস্ত মাছেদের রানি—চিংড়িরানি—এক দিন সকাল বেলায় একটি ফোটা পদ্মফুলের পাশে পদ্মপাতায় বসে বেশ আরামে চুল শুকুচ্ছিলেন।

(১)
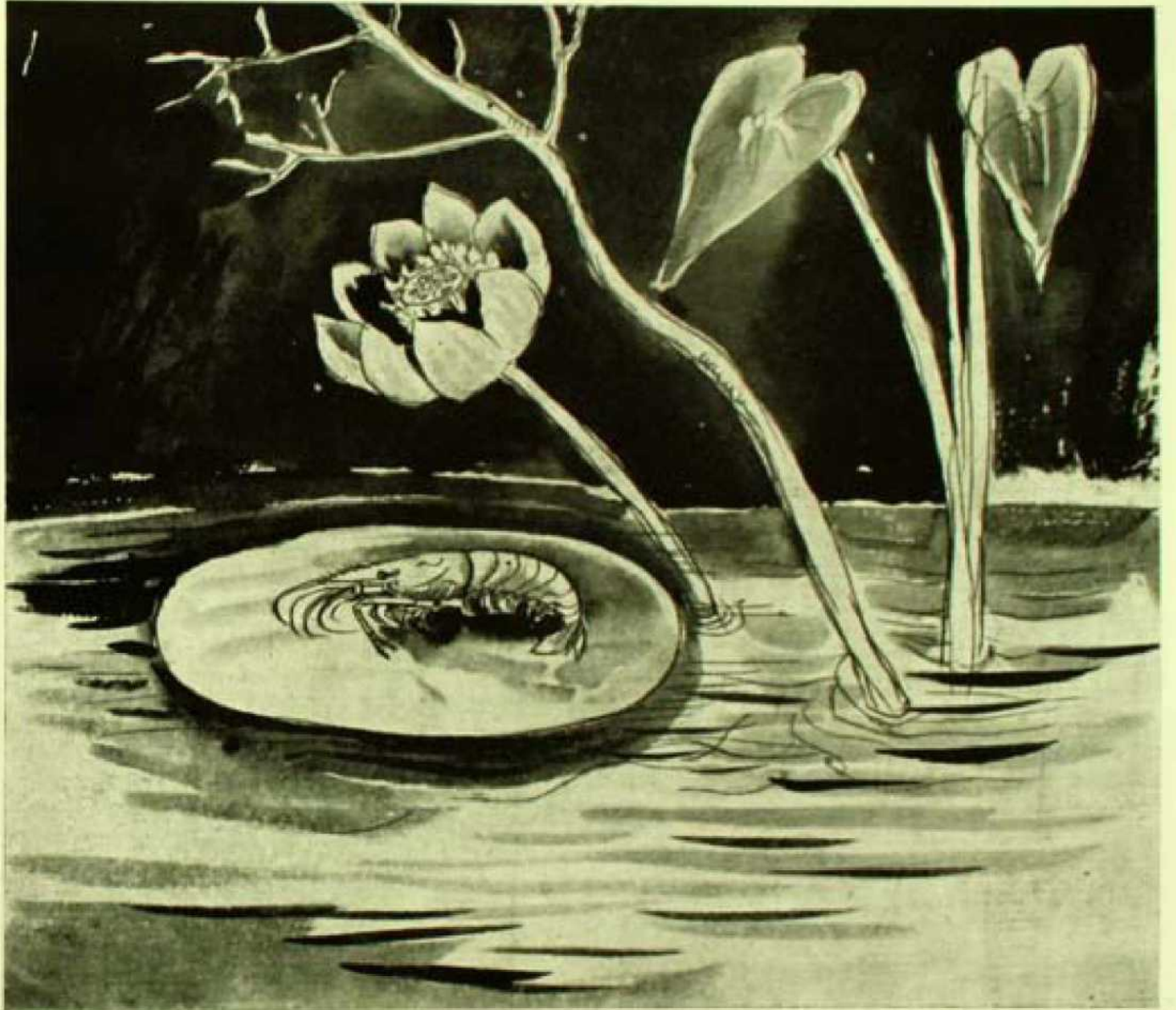
২

এমন সময় কোথা থেকে এক কাক পাশের একটি গাছের শুকনো ডালে উড়ে এসে বসে বিশ্রী 'কা' 'কা' স্বরে বলে উঠল, "ওলো চিংড়ি, তোকে আমি খাব লো, খাব।" চিংড়িরানি মনে মনে ভারি অপমানিত বোধ করলেন ও অভদ্র কাকের কথার কোন জবাব না দিয়ে অঙ্গভঙ্গি করে শুধু বিরক্তি প্রকাশ করলেন। মূর্খ কাক তাঁর এ সঙ্কেত অগ্রাহ্য করে বারবার একই কথা বলতে লাগল, "ওলো চিংড়ি, তোকে আমি খাব লো, খাব।"

(২)

৩

তখন চিংড়িরানি কাকের এই দুর্ব্যবহার আর সহ্য করতে না পেরে তুড়ুক করে জলে নেমে পড়লেন এবং বেগে গভীর জলে মাছেদের দরবারে কাকের বেয়াদপির কথা জানাতে চললেন।

(৩)

৪
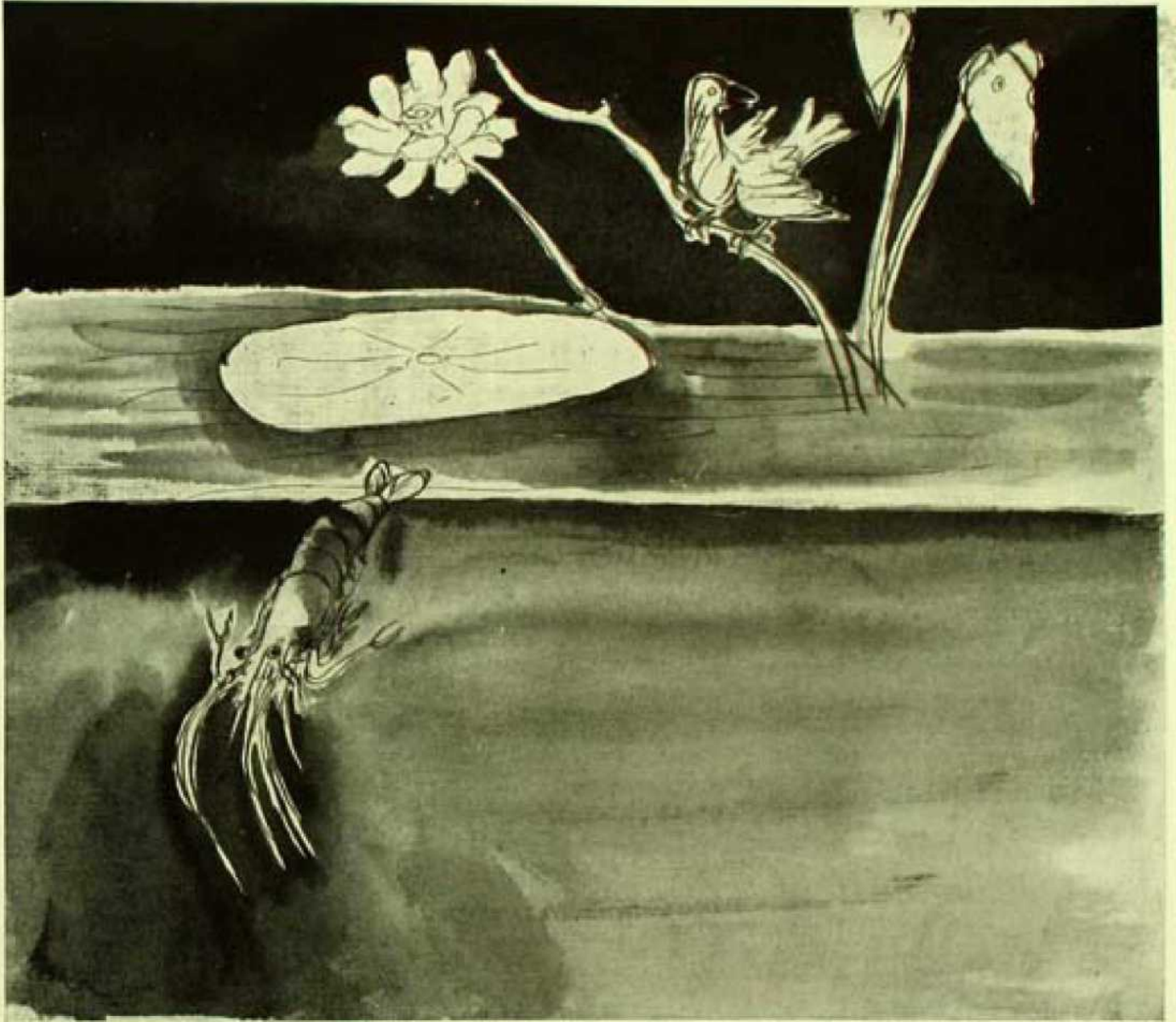
চিংড়িরানি যতই নীচে নামেন জলের রঙও তত বদলায়। প্রথমে ফিকে সবুজ, তার পর ঘোর সবুজ, তার পর নীল, গাঢ় নীল—এমনি করে জলের রঙ বদলায় রানি যতই নীচে নামেন। খুব গভীর কাল জলে রানি গিয়ে পৌঁছুতেই রঙ-বেরঙের অনেক ছোট, বড়, মাঝারি মাছের দল তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল সার বেঁধে। চিংড়িরানি তখন কাকের অভদ্র ব্যবহারের সব কথা জানিয়ে তার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে আদেশ দিলেন। মাছের দল নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তার পর মুখফোঁড় পুঁটি মাছ ধীরে ধীরে রানির কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে, "রানিমা, আমাদের আর লজ্জা দেবেন না, এ অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া আমাদের শক্তির বাইরে। কাক আকাশের পাখী, আমরা জলের মাছ ; তার উপর তার শক্ত নখ, শক্ত ঠোঁট।" তার পর মাছের দল ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলে গেল।

(৪)

৫

চিংড়িরানি কি করবেন, দুর্বলদের রানি তিনি।—মনের দুঃখে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন—জলের উপর মুক্তোর মত দুটি বুদ্বুদ ভেসে উঠল।

(৫)

৬

এখন থেকে তিনি আর গভীর জলে থাকেন না—অপদার্থ মাছের দলে আর মেশেন না,—রাগে, দুঃখে একলাই সরোবরের তীরের দিকে ঘুরে বেড়ান। এমনি করে এক দিন ঘুরতে ঘুরতে অনেক দিনের পর তাঁর কাঁকড়া-দাদা ও বৌদিদির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কাঁকড়া-দাদা আর বৌদিদি অনেক শামুক ও গেঁড়ি-গুগ্‌লির সঙ্গে একটি কাৎ-করা গেরস্তর-ফেলে-দেওয়া হাঁড়ির উপর বসে রোদ পোয়াচ্ছেন।

(৬)

৭
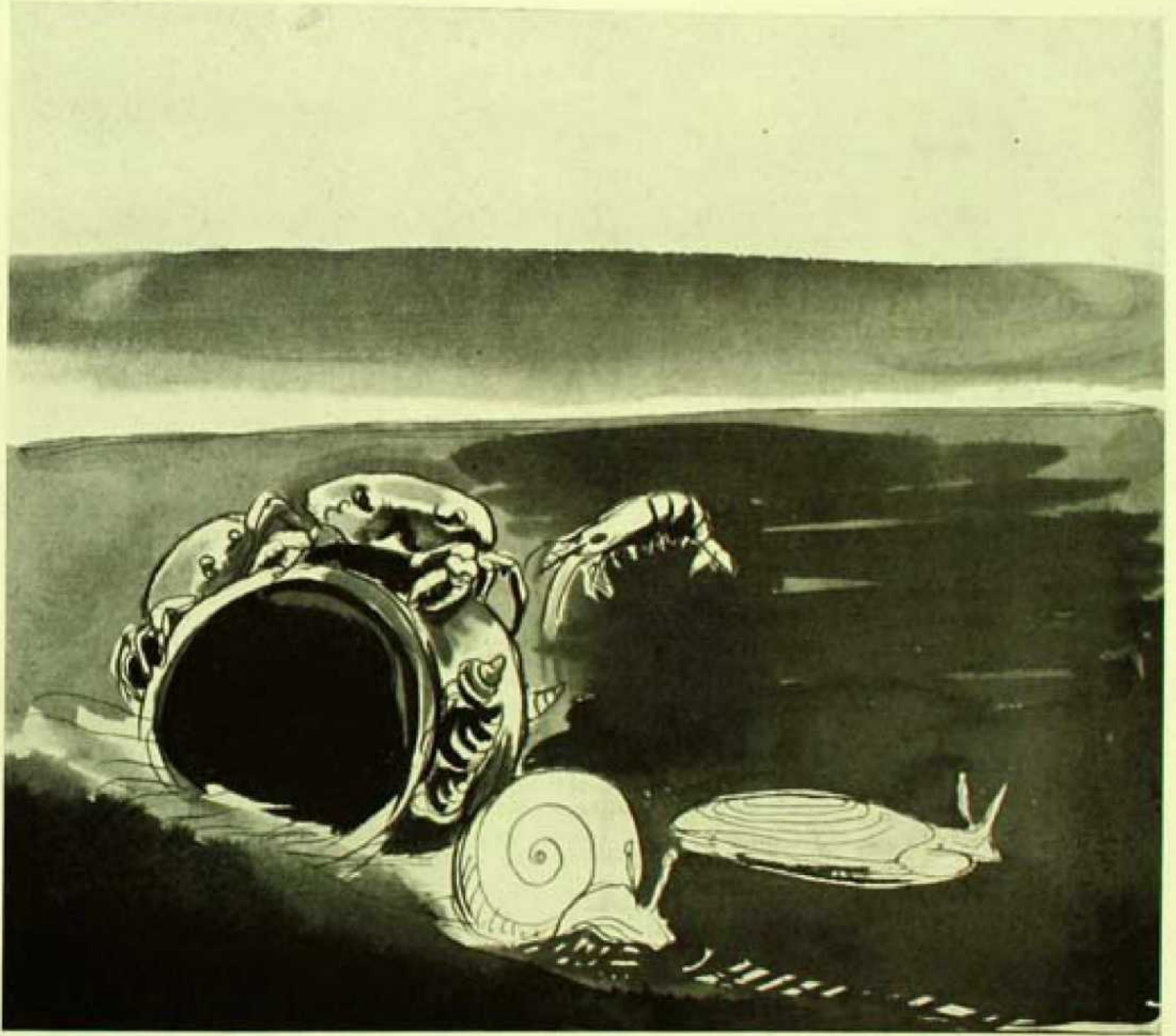
অনেক দিন বাদে, মাছেদের রানি, নিজের ছোট বোন চিংড়িরানিকে দেখতে পেয়ে কাঁকড়া-দাদা খুব খুশি হলেন, এবং আদর করে সেই হাঁড়িরই এক পাশে তাঁকে বসিয়ে সুখ-দুঃখের কথা কইতে সুরু করলেন। কথায় কথায় চিংড়িরানি কাকের কথা,—দুর্বল মাছেদের অপদার্থতার কথা—আর সেই কারণে তাঁর নিজের মনের দুঃখের সব কথা, কাঁকড়া-দাদাকে বললেন। কাঁকড়া সব কথা খুব গম্ভীরভাবে শুনে চিংড়িরানিকে অভয় দিলেন ; তাঁকে বললেন, "চল দিদি, তুমি চুল শুকুতে, আমি কাককে জব্দ করে দেব, তার উচিত শাস্তি দেব।"

(৭)
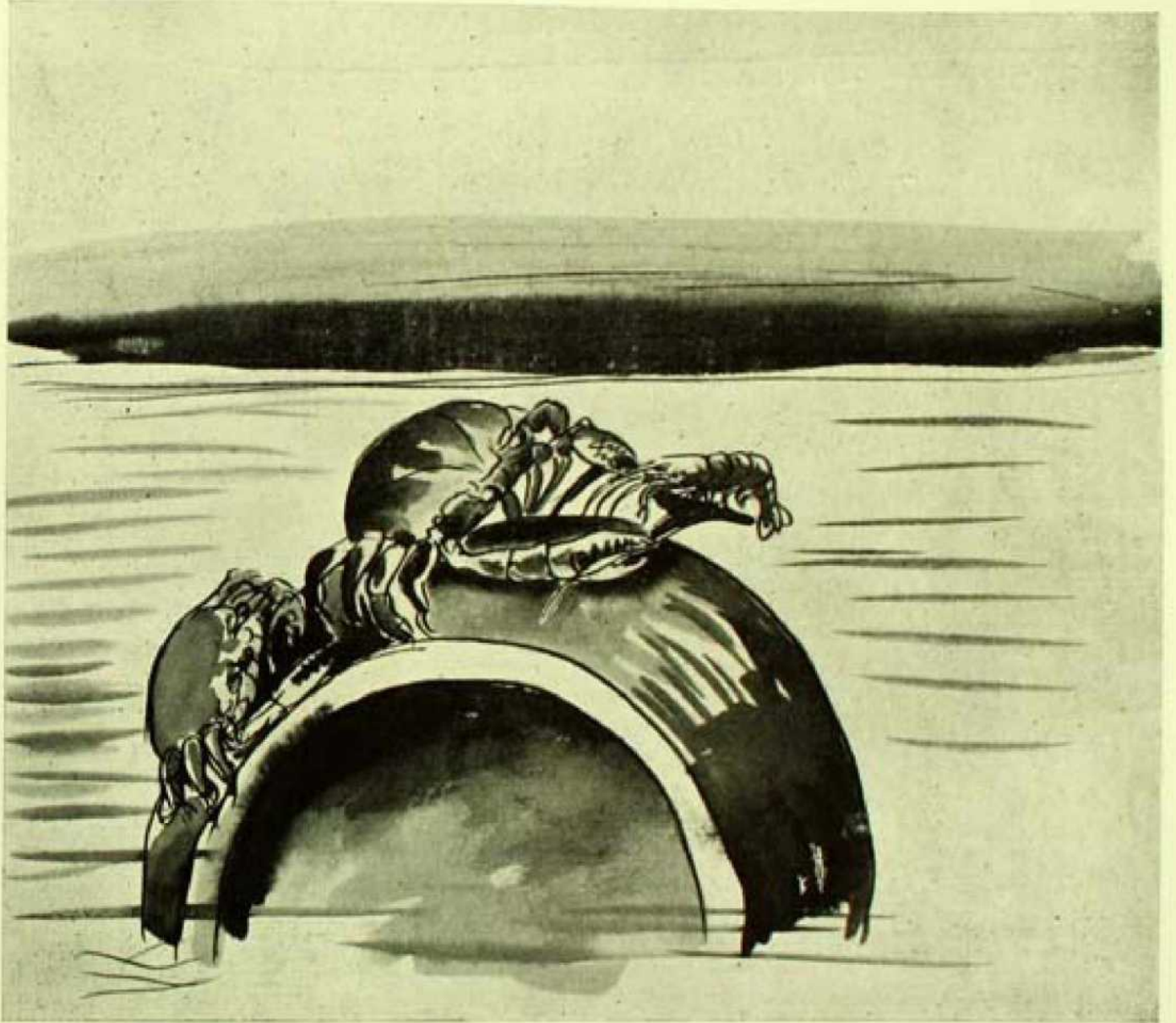
৮

চিংড়িরানি আবার চুল শুকুতে বসলেন সেই পদ্মপাতায়, আর কাঁকড়া সেই গাছটির শুকনো ডালের পাশেই একটা বড় কচুপাতার আড়ালে লুকিয়ে বসে রইলেন।

(৮)
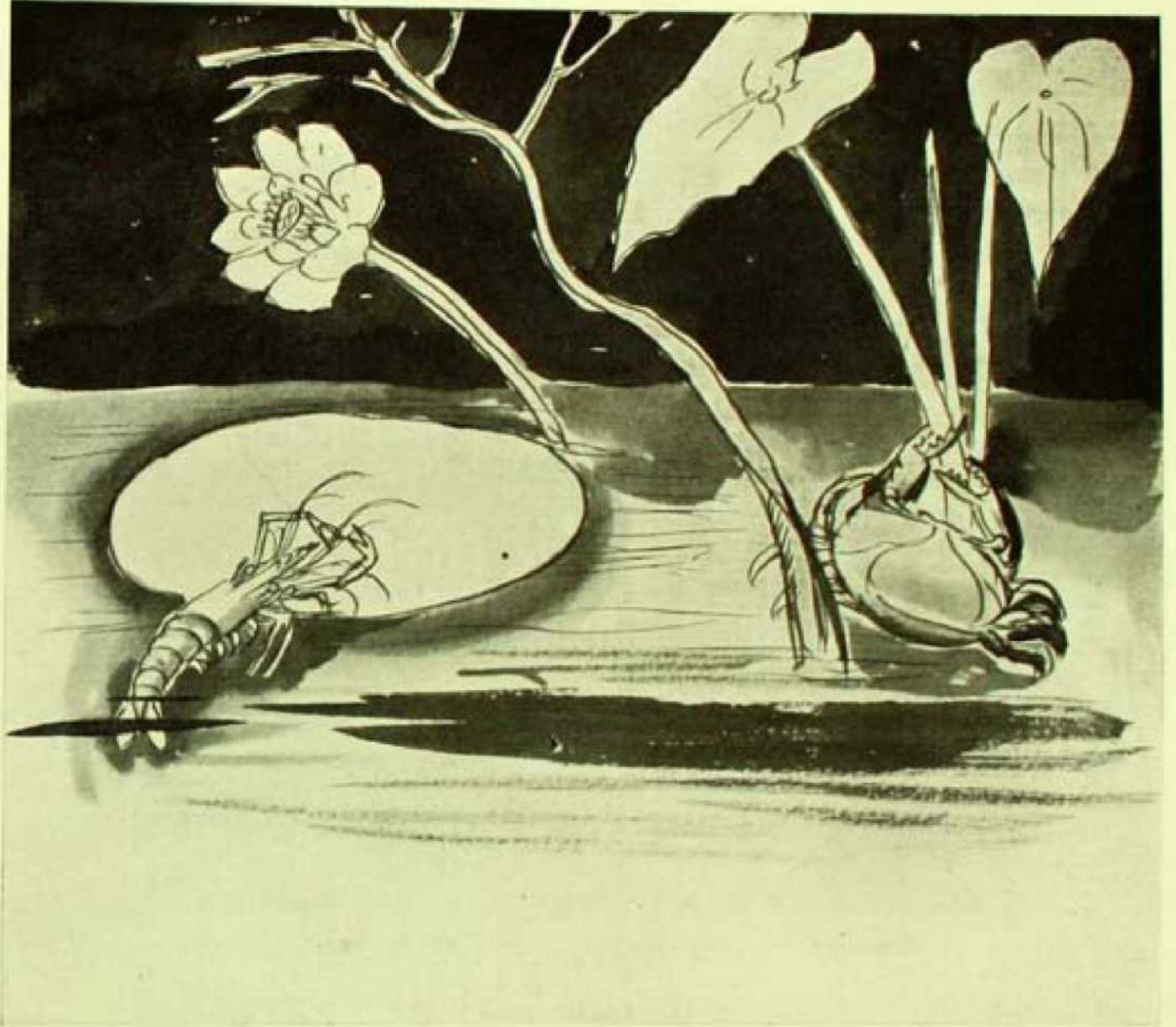
৯

কাক এল,—আবার সেই শুকনো ডালে বসে 'কা' 'কা' করে বলে উঠল, "ওলো চিংড়ি, তোকে আমি খাব লো, খাব।"

(৯)

১০

তখন কাঁকড়া বেশ ভাল করে কচুর ডাঁটায় বসে নিলেন, আর যেই কাক আবার মুখ খুলতে যাবে অমনি পিছন থেকে তাঁর শক্ত দাড়া দিয়ে কাকের ঠোঁট ও পা প্রাণপণ শক্তিতে চেপে ধরলেন। ডানার ঝাপট দিয়ে কাক আত্মরক্ষার অনেক চেষ্টা করলে, কিন্তু সবই বৃথা হল। তাদের ঝটাপটিতে ফোটা পদ্মফুলটি শুধু ঝরে পড়ল। কাঁকড়ার দাড়ার চাপে দুষ্ট কাকের প্রাণ বেরিয়ে গেল, আর আনন্দে চিংড়িরানি পদ্মপাতার উপর নৃত্য করতে লাগলেন।

চিরকাল জগতে প্রবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করে, আর দুর্বল, দুষ্ট প্রবলের হাত থেকে প্রবলতরের সাহায্যে আত্মরক্ষা করে। চিংড়িরানির গল্প তারই একটি দৃষ্টান্ত।

(১০)

১১

অনেক দিন আগে এমনিতর আর এক ঘটনা ঘটেছিল। তোমরা সকলেই জান, হাতীরা জলকেলি করতে ভালবাসে। একবার সমুদ্রের জলে খেলা করতে গিয়ে এক হাতীর সর্দারের পা আটকে গিয়েছিল। এমন সময় এক দুষ্ট কুমীর এসে তাকে আক্রমণ করলে। শক্তিশালী গজরাজও সে অবস্থায় দুর্বল হয়ে পড়েছিল। প্রাণের দায়ে ব্যাকুলভাবে তখন সে ভগবান্ হরিকে ডাকতে লাগল। ভক্তের কাতর আহ্বানে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী হরি গরুড়ে চেপে সেইখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং গজরাজকে বিপদ্ থেকে উদ্ধার করলেন।

(১১)

১২

বহু যুগ আগে সমুদ্র-মন্থনে অমৃত উঠেছিল। সেই অমৃত নিয়ে দেবাসুরে ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল। অমৃত খেলে অমর হওয়া যায়, তাই প্রথমে জোর করে অসুরেরাই অমৃত কেড়ে নিয়েছিল খেয়ে অমর হবে বলে। কিন্তু অসুরেরা অমর হলে জগতের ক্ষতি, তাই জগৎপিতা ভগবান্ বিষ্ণু মোহিনী-মূর্তি ধরে তাদের ভুলিয়ে অমৃত কেড়ে নিলেন। তার পর যখন সব দেবতারা অমৃত পান করতে বসেছেন, তখন চন্দ্র আর সূর্য তাঁদের পাশেই দেবতার ছদ্মবেশে রাহু নামে এক দুষ্ট অসুর অমৃত পান করতে বসেছে দেখে,, বিষ্ণুকে বলে দিলেন। রাহুর মুখ থেকে অমৃত পেটে পড়বার আগেই বিষ্ণু সুদর্শন-চক্র দিয়ে রাহুর গলা ফেললেন কেটে এবং অমৃতও কাটা গলা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সেই রাগে, সুবিধা পেলেই রাহু-মুখ চন্দ্র ও সূর্যকে গ্রাস করে, কিন্তু বিষ্ণু রাহুর গলা কেটে তাঁদের রক্ষা করেছেন।—চন্দ্র-সূর্য আত্মরক্ষা করলেন বিষ্ণুর শরণ নিয়ে।

(১২)

১৩

আর একবার মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে দেবতারা ভীষণ বিপদে পড়েছিলেন। ভয়ে ব্রহ্মা কোথায় পালালেন তার ঠিক নাই। বিষ্ণু শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ফেলে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন, আর শিব মহিষের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে "ত্রাহি দুর্গা, ত্রাহি দুর্গা" বলে ছুটেছিলেন। তখন শিবের আর্তনাদে শিবশক্তি সিংহবাহিনী দুর্গা দশ হাতে দশ অস্ত্র নিয়ে দুষ্ট মহিষকে যুদ্ধে বিনাশ করেছিলেন। তাই আমরা সবাই বিপদের হাত থেকে, ভয়ের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য মহিষমর্দিনী সিংহবাহিনীর পূজা করে থাকি। শিবের সঙ্গে দুর্গার বিয়ে হয়েছিল। ইনি জগন্মাতা—সর্ব জীবের প্রাণস্বরূপা।

(১৩)

১৪

পূর্বে দক্ষ প্রজাপতি নামে এক মস্ত রাজা ছিলেন। তাঁর বাড়ীতে এক শিবমন্দির ছিল। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেই মন্দিরে শিবপূজা করতেন। দক্ষ রাজার মেয়ে সতী সেই ব্রাহ্মণের ফুল তুলে, চন্দন ঘষে, পূজার যোগাড় করে দিত। এক দিন ব্রাহ্মণ দেখলেন সতী বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠেছে—তার বয়স বাড়ছে। বিয়ে হয়ে শ্বশুর-বাড়ী চলে গেলে কে তাঁর পূজার যোগাড় করে দেবে—এই ভেবে তিনি খুব কাতর হয়ে শিবঠাকুরকে অনুরোধ করলেন, "ঠাকুর, তুমি যদি সতীকে বিয়ে কর তাহলে আমার পূজার কোন ব্যাঘাত হয় না।" ভক্তের ভগবান্ শিব ব্রাহ্মণের কথা ঠেলতে পারলেন না—সতীকে বিবাহ করতে রাজী হলেন।

(১৪)

১৫

শিব বরবেশে ষাঁড়ে চড়ে বিবাহ করতে চলেছেন,—দেবতা ও ভূতেরা সব বরযাত্রী।

(১৫)

১৬

টোপর-মাথায় শিব গিয়ে বিবাহ-সভায় বসলেন। দক্ষ প্রজাপতি কন্যা সম্প্রদান করলেন। মেয়েরা সব শাঁখ বাজিয়ে হুলুধ্বনি করলে, তার পর বিবাহের নিয়মে মন্ত্রপাঠ হবে। কিন্তু সেই পুরোহিত-ব্রাহ্মণ বরবধূকে গড় হয়ে এক প্রণাম করে বললেন, "বিবাহ হয়ে গেছে— বরবধূ উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক।" দক্ষ রাজা বিবাহে রীতিমত নিয়ম পালন করা হল না দেখে মহা চটে গিয়ে আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন—বললেন, "আমি প্রজাপতি—মন্ত্রের রক্ষক, আর আমার মেয়ের বিয়েতে মন্ত্রপাঠ হবে না?"

ব্রাহ্মণ তখন জবাব দিলেন, "শিব হচ্ছেন মন্ত্রের মূর্তি, স্বয়ং তিনিই যখন উপস্থিত তখন আর মন্ত্রের প্রয়োজন কি?" এ কথা দক্ষকে মানতেই হল এবং শিব ও সতীর বিয়ে হয়ে গেল।

(১৬)

১৭

দক্ষ প্রজাপতির জামাই পছন্দ হয়নি। শিবের বেশভূষা ভাল নয়—তিনি সর্বাঙ্গে ছাই মেখে থাকেন,—ঘর-দোর কিছুই নেই তাঁর, তার উপর আবার যত ভূত-প্রেত সঙ্গে নিয়ে ষাঁড়ে চড়ে পাগলের মত ঘুরে বেড়ান। অতুল বিত্তশালী রাজা দক্ষের এমন জামাই ভাল লাগেনি। তার উপর আবার মন্ত্রের অপমান করা হয়েছে।

খুব রাগ হল তাঁর। মনে মনে ঠিক করলেন, তিনি এমন এক যজ্ঞ করবেন তাতে শুধু মন্ত্র থাকবে—শিব থাকবে না। শিব ছাড়া তিনি সব দেবতাদেরই নিমন্ত্রণ করলেন। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে দিয়ে এক বিরাট্ যজ্ঞশালা নির্মাণ করালেন। এইখানি সেই যজ্ঞশালার ছবি।

(১৭)

১৮
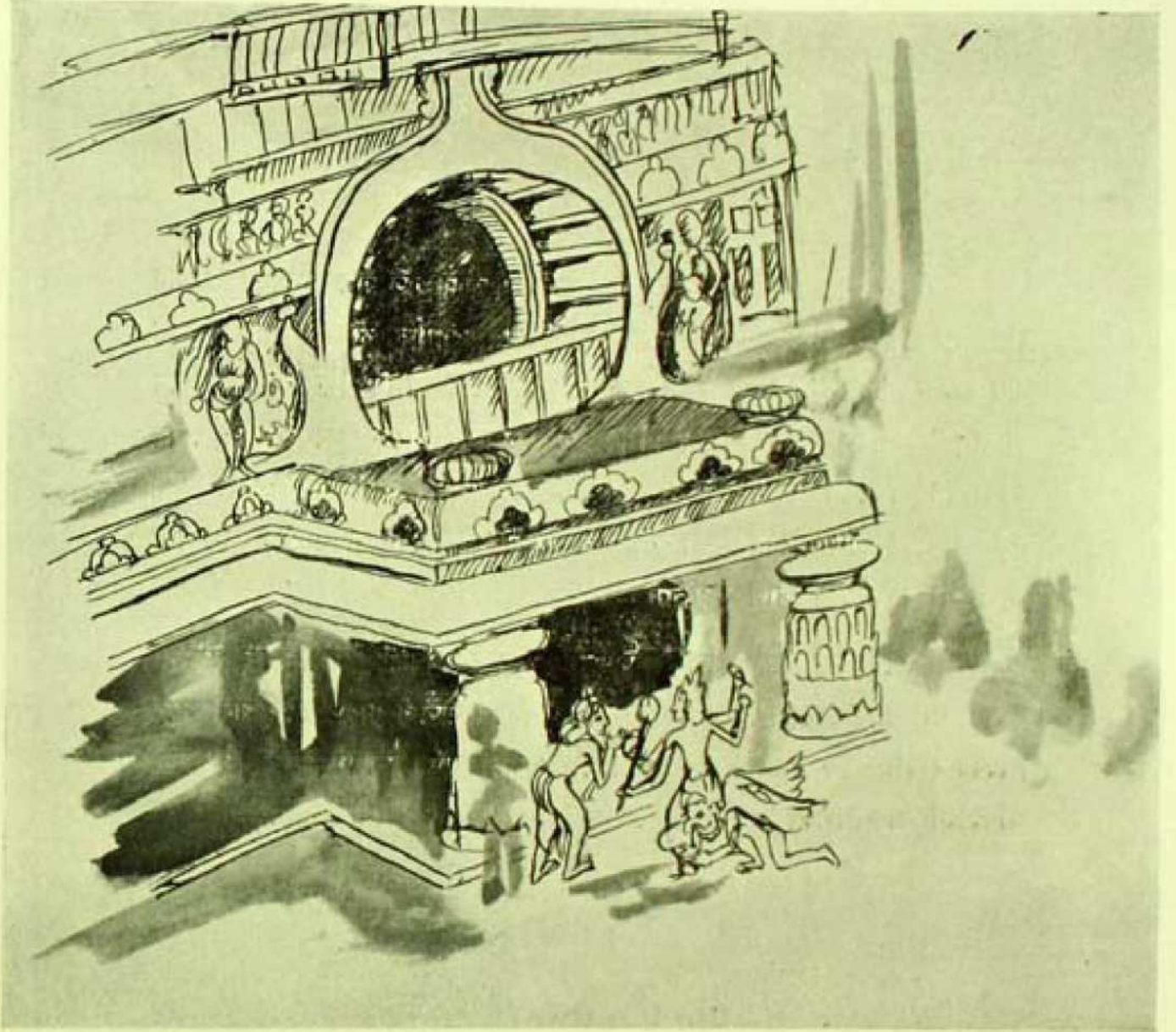
এ দিকে শিবের কাছে অনেক অনুনয়-বিনয় করে সতী বাপের বাড়ী এলেন যজ্ঞ দেখতে। দক্ষকে তিনি বললেন, "শিব আমার স্বামী। বাবা, তুমি যদি তাঁকে তোমার এই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ না কর তো আমি কি করে এখানে থাকি ?" শিবকে নিমন্ত্রণ করবার জন্য তিনি পিতাকে অনেক অনুরোধ করলেন। শিবের নাম শুনেই দক্ষ প্রজাপতির ভীষণ রাগ হল এবং বিশ্রী কটু ভাষায় তিনি শিবের নিন্দা করতে লাগলেন। শিবের নিন্দা শুনে অপমানে ও লজ্জায় সতী দেহ ত্যাগ করলেন।

হঠাৎ যেন কি হয়ে গেল। উৎসবের মধ্যে কান্নার সুর বেজে উঠল। সতীর মা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলেন। এ দিকে সতীর দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে শিবের মাথার একটি জটা আপনি ছিঁড়ে পড়ল আর ভীষণাকৃতি এক রুদ্র ভীমবেগে আকাশপথে ছুটে এসে দক্ষের মাথায় ত্রিশূলের আঘাত করলে।

(১৮)

১৯

নিমিষের মধ্যে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। দেখতে দেখতে শিবের সঙ্গে অনেক ভূত এসে যজ্ঞশালা লণ্ডভণ্ড করে দিলে। শিবের পায়ের চাপে দক্ষেরও বুঝি প্রাণ যায়—এমন সময় সতীর মা এসে শিবের পা জড়িয়ে ধরে স্বামীর জীবন ভিক্ষা চাইলেন। সতীর মায়ের অনুরোধে শিব শান্ত হলেন—দক্ষ প্রাণে বাঁচলেন। কিন্তু শিবকে অপমান করেছিলেন বলে দক্ষের ছাগমুণ্ড হয়ে গেল।

(১৯)

২০

পটুয়া যখন এই পর্যন্ত ছবি এঁকেছে তখন হঠাৎ তার হাত থেকে তুলি খসে পড়ল, কে যেন তার কান ধরেছে! ফিরে দেখলে,—মন্দিরের বেদী থেকে নেমে-আসা মূর্তির মত সুঠাম-দেহধারী এক সুন্দর পুরুষ তাকে বলছেন, "দুর্গাপূজার ছবি আঁকছিস? আগে শোন, দুর্গা কে,—দুর্গা কি।" তার পর আবার বললেন, "দুর্গা হচ্ছেন সাক্ষাৎ প্রকৃতি জগজ্জননী। তিনি জলে রয়েছেন, স্থলে রয়েছেন, ফলে রয়েছেন, ফুলে রয়েছেন—জীবনের সব-কিছুতেই তিনি প্রাণ হয়ে ছড়িয়ে রয়েছেন। কিন্তু এখনকার মানুষ দুর্গার মানে ভুলে গেছে।" তার পর ছবি দেখালেন—যত্নের অভাবে মানুষের কি দুর্গতি,—সংস্কারের অভাবে পুকুরে পাঁক হয়েছে, মাছ নেই,—চাষের অভাবে মাঠের চেহারা রুক্ষ,—বাগান কাঁটাগাছে ভরে গেছে—আপনা আপনি প্রকৃতির দয়ায় যা-কিছু ফল ফলেছিল তাও চোরে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে।

(২০)

২১

তারপর সেই সুন্দর পুরুষ খুব যত্ন করে কাঁধে হাত রেখে আসল দুর্গা-পূজারীর জীবনের ছবি তাকে দেখালেন। তার পুকুর-ভরা মাছ—ক্ষেত-ভরা ফল ও ফসল—চারিধারে প্রকৃতির রূপ স্নিগ্ধ ও শ্যামল। পরস্পরের মধ্যে প্রীতির আদান-প্রদানে জীবন মধুময়।

(২১)

২২

সে পথ চলে কর্তব্যের বোঝ কাঁধে নিয়ে নৃত্য-ছন্দে। গৃহে বৃদ্ধের করে সেবা। রাত্রে সৎ গ্রন্থ পাঠ করতে করতে আরামে ঘুমিয়ে পড়ে। সাক্ষাৎ দুর্গাই যেন তার স্ত্রীরূপে শিয়রে বসে সেবা করেন,—কাল-সাপের দংশন থেকে তাকে রক্ষা করেন; আর বনে বাঘ থাকা সত্ত্বেও হরিণ যেমন নিদ্রা যায় তারও নিদ্রা তেমনি ভয়হীন। অন্তর তার দেবীর আদেশের প্রতীক্ষায় সর্বদাই ঊর্ধ্বমুখী।

(২২)

২৩

আর এখনকার জীবনের মানে-ভুলে-যাওয়া মানুষ—যারা কোনও রকমে নিয়ম-রক্ষার জন্য দুর্গাপূজা করছে তাদের জীবনের রূপ দেখ।—অত্যন্ত সাবধানে গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে ভয়ে ভয়ে পথ চলেছে—নিজেকে বিশ্বাস করে না তাই সকলকেই তার অবিশ্বাস, সর্বদাই অলসভাবে বৃথা পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, কিছু দেখে না—কিছু ভাবে না।—বিশ্রামের স্থান ঘরে গিয়ে—গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসে। বেশীর ভাগ সময়ই রোগে বিছানায় শুয়ে ছটফট করে। স্ত্রীও তার স্বামিসেবা না করে প্রতিবেশিনীর পায়ের ধূলো নিয়ে তার মঙ্গল-কামনা করে। ঘরে শিবের ছবিতে ধূলো পড়েছে—গণেশের মূর্তির সামনে মাকড়সার জাল, আর বাড়ীর ছাদে মৃত্যু উঁকি মারছে।

(২৩)

২৪

এখনকার দুর্গাপূজো যেন একটা ব্যবসা হয়ে উঠেছে। পূজোর দালানে প্রতিমার সামনে ভক্ত গৃহস্থকে আর দেখা যায় না। যারা দক্ষিণা পাবে—পুরোহিত কামার ডেনকর ঢাকি ঢুলি—পূজোবাড়ীতে এখন শুধু তাদেরই ভীড়, আসল পূজারী কোথাও নাই।

(২৪)

২৫
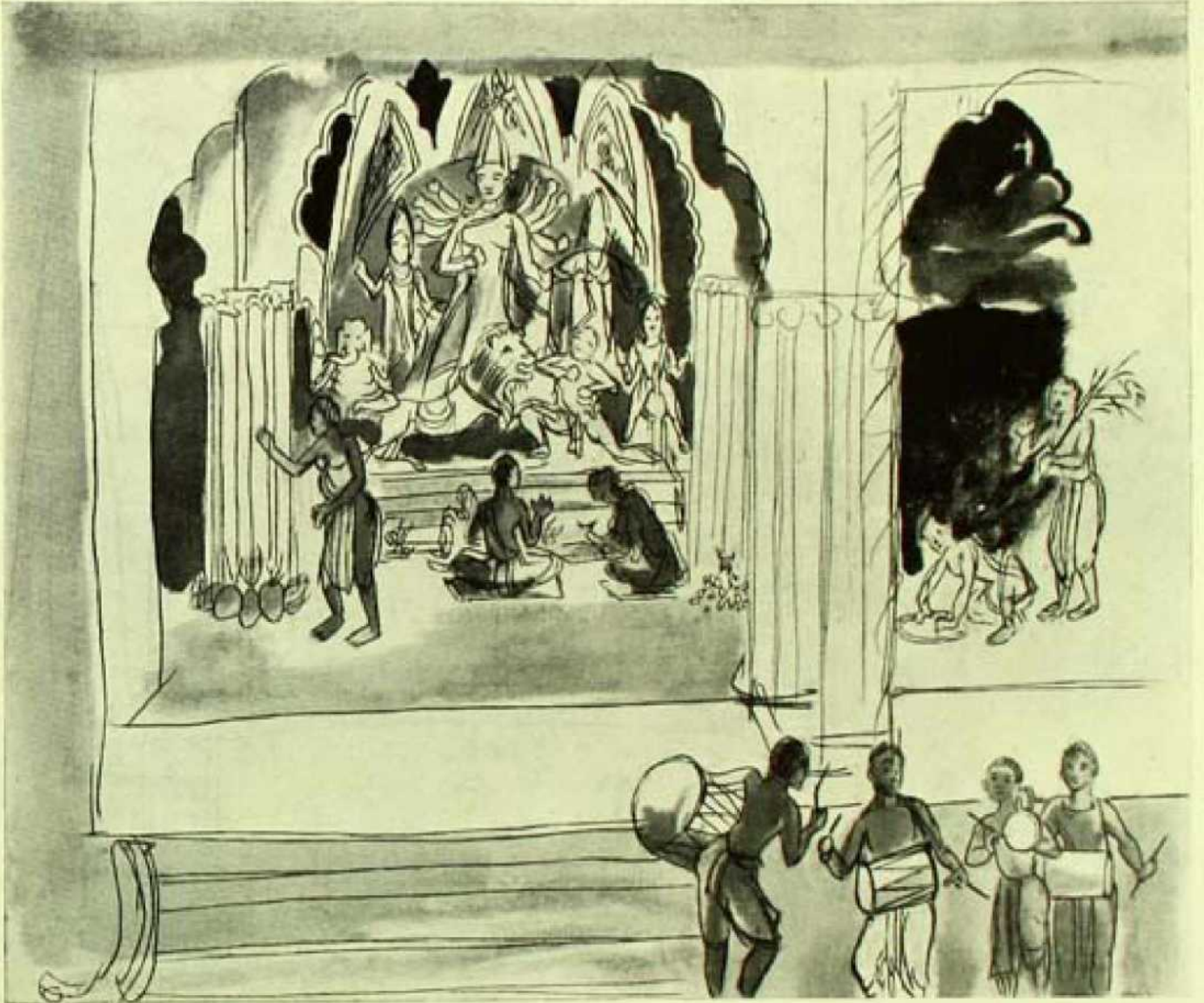
আর এক দল আছেন আচারসর্বস্ব লোক। টাকি রেখে, নামাবলী গায়ে দিয়ে, শুদ্ধভাবে মন্ত্র পড়ে পূজার বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান মেনে দুর্গাপূজা করেন। কিন্তু দুর্গার প্রসাদ বিত্ত, ঐশ্বর্য, শক্তিপূজার ভান না করেও বিদেশীয় শক্তিমানেরা লুটে নিয়ে যাচ্ছে তাঁদের অগোচরে, প্রতিমার পিছন থেকে।

(২৫)

২৬

ধনীর বাড়ীর পূজা।—নহবৎখানায় নহবৎ বাজছে, দ্বারে ঘট ও কলাগাছ দিয়ে সকলকেই আহ্বান করা হচ্ছে উৎসবে যোগ দিতে; কিন্তু অভ্যর্থনা নেই। তাই দরিদ্র মা ও ছেলে দূর থেকে প্রতিমা প্রণাম করেই চলে যাচ্ছে—গৃহকর্তার অভ্যর্থনা না পেয়ে জগজ্জননী দুর্গাই যেন ফিরে যাচ্ছেন।

(২৬)

২৭

শক্তির প্রতিমা দুর্গাকে ঘিরে সবাই মিলে উৎসব করলে শক্তি লাভ হয়,—জীবন জয়যুক্ত হয়—কিন্তু এখনকার সার্বজনীন দুর্গাপূজায় সকলে আর যোগ না দিয়ে অর্থ দান করেন মাত্র; তাই পূজা-প্রাঙ্গণে পুরোহিত ও ঢাকি-ঢুলি ছাড়া আর কেউ নাই।

(২৭)

২৮

গ্রামে কোথাও কোথাও প্রতিমার বদলে ঘটস্থাপনা করেও দুর্গাপূজা করা হয়।

(২৮)

২৯

ভক্তিভরে দুর্গার আরাধনা জীবনের পূজা যাঁরা করেন—অন্তরের আনন্দ ও চোখের জল তাঁদের পূজার উপকরণ। তাঁদের গৃহে দুর্গা তাঁর ছেলে-মেয়ে—লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশকে সঙ্গে নিয়ে মেয়েদের বাপের বাড়ী আসার মত আবির্ভূতা হন। শক্তি ঘরে এলেন, সঙ্গে এলেন লক্ষ্মী ঐশ্বর্য নিয়ে, সরস্বতী বিদ্যা নিয়ে, দুই ছেলে তাঁর সঙ্গে এলেন বীর কার্ত্তিক আর জ্ঞানী গণেশ।

(২৯)

৩০

দক্ষ-যজ্ঞের সময় সতীর মৃত্যু হয়েছিল, তবে আবার বাপের বাড়ী ফিরে আসেন কি করে? এ কথা তোমাদের মনে উঠতে পারে। কিন্তু একেবারে মরে কেউই যায় না—আবার জন্ম হয়। এবার সতীর জন্ম হয়েছে পাহাড়ের রাজা বরফে-ঢাকা হিমালয়ের ঘরে।

(৩০)
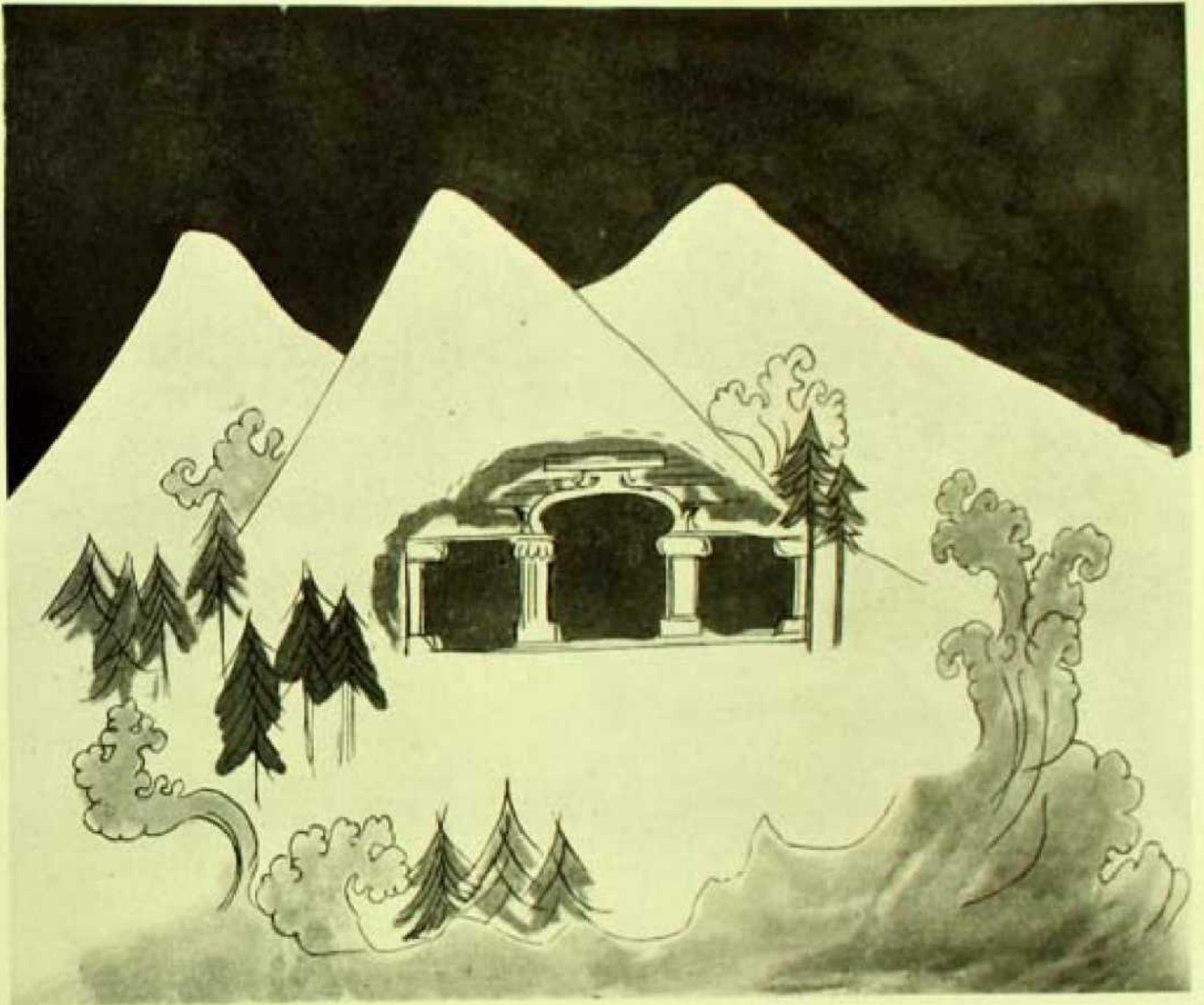
৩১

গিরিরাজ মেয়ের নাম রাখলেন উমা। উমা যখন ছোট্ট মেয়ে সবে আধ-আধ কথা ফুটেছে তখন রোজ সন্ধ্যাবেলায় তাঁর মা শিবঠাকুরের জীবনের নানা গল্প তাঁকে বলতেন। শিব আর কালীর গল্প, শিবের বিষ-পানের, শিবের নটরাজ হওয়ার, ধ্যানী ও কল্পতরু হওয়ার গল্প তিনি মন দিয়ে শুনতেন।

(৩১)

৩২

এমনি করে রোজ রোজ শিবের গল্প শুনতে শুনতে উমা বড় হয়ে উঠতে লাগলেন এবং মনে মনে ঠিক করলেন শিবকেই তিনি বিয়ে করবেন। মার কাছে শুনেছিলেন যে শিব থাকেন বেলতলায়, একাগ্র হয়ে তাঁকে ডাকলে দেখা দিয়ে তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, ইত্যাদি। তাই উমা একলা বেলতলায় গিয়ে—মাটি দিয়ে শিবের মূর্তি গড়ে, প্রদীপ জ্বালিয়ে, একমনে শিবকে ডাকতে লাগলেন। কিন্তু তখনও তাঁর মন একাগ্র হয়নি, তাই শিবকে দেখা গেল না।

(৩২)

৩৩

তখন উমা মনকে একাগ্র করবার জন্য হিমালয়ের বরফ-গলা ঠাণ্ডা জলে আবক্ষ ডুবে থেকে হাতে পদ্মবীজের মালা নিয়ে—শিবনাম জপ করতে লাগলেন। এমনি করে কত দিন কেটে গেল কিন্তু শিব এলেন না।

(৩৩)

৩৪

তখন উমার তপস্যা হয়ে উঠল আরও কঠোর। তিনি ঠিক করলেন প্রাণ যায় সেও ভাল, শিব না-আসা পর্যন্ত তপস্যা তিনি করবেনই। তার পর এক গিরি-গুহায় প্রবেশ করে, এক পায়ে দাঁড়িয়ে শিবনাম জপ করতে লাগলেন।

(৩৪)

৩৫

বহু দিন বাদে একাগ্র উমার তপস্যায় শিব আর ঠিক থাকতে পারলেন না। মূর্তি ধরে এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন—বললেন, "তোমার তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি—বর প্রার্থনা কর।" আনন্দে উমার মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুল না। তিনি শুধু ভূমিষ্ঠ হয়ে শিবের পায়ে আত্মসমর্পণ করলেন। আর দেবতারা আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি করলেন। আবার হরগৌরীর মিলন হল।

(৩৫)

৩৬

তার পর থেকে প্রতি বছরে তিন দিনের জন্য উমা বাপের বাড়ী আসেন। তাঁর এই বাপের বাড়ী আসার যে উৎসব তাই আমাদের দুর্গোৎসব। পূর্বে তাই, পঞ্চগ্রাম এক হয়ে অর্থাৎ সবাই মিলে দুর্গাপূজা করে শরৎকালে বিশ্বপ্রকৃতিকে নিজেদের কন্যা বলে আহ্বান করত।

(৩৬)